International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 72-77
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.6.issue.05W.071

শৈলবালা ঘোষজায়া ও তাঁর গল্প বিশ্ব

ড. প্রিয়ংকা চন্দ

Abstract

Sailabala Ghosh jaya's centre of attnaction os human, thein different characters and different mindsets. While she take up social systems, she has given a new definition of free and confident women. Leaving behind the male bashing attitude, she evinces the protests of women backed by their male counterpart.

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত সময় পর্বে আবির্ভূত অনেক গল্পকারের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়া একজন। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী' থেকে 'বঙ্গশ্রী' পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকায়। তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়ের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্‌স' থেকে।

শৈলবালার পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী ছিলেন প্রকৃতই সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি মূলত একজন চিকিৎসক, তবে সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। কাজেই ঘরে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থাবলী ছিল যত্নে রক্ষিত। এই গ্রন্থ থেকে শৈলবালা পিতাকে পড়ে শোনাতেন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বই। শৈশবে ও বাল্যে তিনি বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সেই পাঠপর্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি কারণ তেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। শ্বশুড়বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারে স্বামী ছাড়া তাঁর লেখাপড়ার চর্চার প্রতি অনুকূল ছিলেন না পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা। তাই সারাদিন সংসারের কাজ শেষ করার পর রাত্রে নিজের ঘরে লুকিয়ে পড়াশোনা করতেন। নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য একটু একটু করে লেখা শুরু করেন। তারজন্য তাঁকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। তবে তাঁর পরিবারের অল্প বয়সী ছেলেরা তাঁর এই অধ্যবসায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। সবচেয়ে বড় কথা শৈলবালার স্বামী নরেন্দ্রমোহন স্ত্রীর সাহিত্য সাধনাকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন।

পনেরো ষোলো বছর বয়স থেকেই তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা পাঠাতে শুরু করেন। সে সময়ে বাংলার গ্রামের বধূর পক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠানো ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রথমত পত্রিকায় সম্পাদক বা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল না। পত্রিকার ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা কারো হাতে পাঠাতে হত লেখা। এভাবেই 'শেখ আন্দু' উপন্যাস লিখে স্বামীর হাত দিয়ে সেটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। আর বিস্ময়ের ব্যাপার হল 'প্রবাসী' পত্রিকা সেদিন তাঁকে বেশ কিছু সম্মান দক্ষিণা দিয়ে উপন্যাসটি গ্রহণ করেন।

এভাবেই তিনি গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে 'সরস্বতী' উপাধি পান। আবার তাঁর সাহিত্য চর্চার জন্য নদীয়ার 'মানদ মণ্ডলী' অযাচিতভাবে 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি দেন। এমনকি আঠারো বছর বয়সে 'বীনার সমাধি' নামে পত্রিকায় লেখা তাঁর একটি গল্প পুরস্কৃত হয়। কোন্ পত্রিকা এবং কারা বিচারক ছিলেন তা জানা না গেলেও সে সময়ে

অল্পবয়সী গৃহবধূর আত্মবিশ্বাস দেখে বিস্মিত হতে হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে শৈলবালা নিজেই জানিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি ভুবনে এগুলো ছাড়া রয়েছে বহু অপ্রকাশিত উপন্যাস, আত্মজীবনী এবং ছোটগল্প।

নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হবার ফলে শৈলবালার হাতে কিছু টাকাও সঞ্চিত হতে থাকে। কারণ সেই সময়ে পত্রিকাতে লেখা প্রকাশিত হলে লেখককে পারিশ্রমিক দেবার রেওয়াজ ছিল। তাই উপার্জনহীন ঘরে বসে থাকা স্বামীকে অর্থকরী বিদ্যা অর্জনের আশায় কলকাতায় যেতে উৎসাহিত করেন। সেখানে গিয়ে স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিও প্যাথি পাঠক্রমে যোগদান করেন। কিন্তু যতদিন যায় শৈলবালা আরো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ শৈলবালার ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। এরপর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপরেও তিনি মেমারিতেই ছিলেন। কিন্তু বিষয় সম্পত্তি জনিত বহু জটিলতায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব সময় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন, তাই বাধ্য হয়ে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রামচন্দ্রপুরের বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে আশ্রয় নেন। এই নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি পান ‘সাহিত্যভারতী’ এবং ‘রত্নাপ্রভা’ উপাধি। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি কখনই সাহিত্য চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি।

তবে শৈলবালা যে সময়ে সাহিত্য জগতে পাড়ি দিয়েছেন, সে সময়ে এবং তাঁর আগে বাংলার যে সমস্ত মহিলা গল্পকাররা স্বপদে আসীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, গিরিবালা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী।

শৈলবালার গল্পে ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাত জনিত সমস্যাটি কেবলই নারীর সমস্যা হয়ে থাকেনি। দারিদ্র্য বঞ্চনা, জাত-পাত এবং সাম্প্রদায়িকতার সংকটকেও তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। এরফলে তাঁর গল্পে এক ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত, বিশ্লেষণধর্মী মননশীলতার পরিচয় অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে এক সংবেদনশীল মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

শৈলবালা তাঁর ‘লাফো’ গল্পে গল্প কথকের মাধ্যমে ... কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। বাংলাদেশের বাঁকুড়া জেলার এক ক্ষুদ্র গোমস্তা বীরেশ্বর পাঁজা সুদূর বর্মা প্রদেশে এসে কিভাবে মগ লাফোতে পরিণত হল- এ তারই কাহিনী। বীরেশ্বর শৈশব থেকেই তার পিতা-মাতাকে হারিয়ে খুড়োর আশ্রয়ে মানুষ হয়েছে। আবার খুড়ো মারা গেলে দুই ভাই-বোন ও খুড়িমার যাবতীয় দায়িত্ব তারই উপর আসে। সেইসঙ্গে গাঁয়ের দুই জমিদারের দীর্ঘকালের বিবাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এদিকে বিজয়া দশমীর রাতে সে কিস্তি আদায় উপলক্ষে পথে শঙ্করের মুখে খবর পায় রায়েদের ছোটবাবু শোক মারফত তার কোন শোভাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। লাফোর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে রাতেই সে ভাই শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে ভোজালী হাতে করে ছোটবাবুর শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হয়। তা দেখে ছোটবাবুর স্ত্রী ও শিশু সন্তানেরা প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে থাকে, মুহূর্তে তার মন দ্রবীভূত হয়। সে শঙ্করকে দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে বলে। কিন্তু ভয়ে শঙ্কর অসম্মত হয়। এদিকে পেছন থেকে লোকজনের উচ্চ কলরব ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে। তখন এক অদ্ভুত ক্রোধ বশত লাফো ভাই শঙ্করের গলায় ভোজালীর কোপ বসিয়ে শঙ্করের রক্তাক্ত মুণ্ডটা নিয়ে ফেরার হয়ে যায়।

গল্পটি এখানে শেষ হলেই হয়ত বা ছোটগল্প হিসেবে ‘লাফো’ গল্পটি গৌরব লাভ করত। কিন্তু এরপরেও লেখিকা জানান বীরেশ্বরের ছোট বোন শোভা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। আর খুড়ীমা জানতে পারেন তাঁর ছেলে শঙ্কর বীরেশ্বরের সঙ্গে বর্মাতে ভালোই আছে। যদিও বীরেশ্বর বর্মায় এসে নিজে তার ভাই- এর রক্তাক্ত মুণ্ডটা এক দেবদারু গাছের তলায় পুঁতে দিয়েছে।

আসলে মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চিত আশঙ্কার সম্ভাবনার দোলায়িত। কারণ বীরেশ্বর নিজেও তো জানতো না যে ছোটবাবুকে খুন করতে এসে নিজের ভাইকেই হত্যা করে ফেলবে। তার হত্যার উদগ্র কামনা কোনোমতেই প্রশমিত হচ্ছিল না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে রক্তের স্বাদ গ্রহণ করতে পারছিল। আর তারই ফলস্বরূপ ভ্রাতৃহত্যা।

আবার মানুষের জীবনের গতি, প্রকৃতি, মানসিকতা, প্রবণতা কখন কিভাবে বাস্তবে রূপ নেবে, কোন্‌দিকে বাঁক নেবে তা বলা যায় না। তাই তো শৈলবালার ‘করুণাদেবীর আশ্রমে’ গল্পের যমুনা যখন সাত মাসের গর্ভবতী, তখন জলে ডুবে গিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়। কারণ অবিবাহিত মাতৃত্ব সমাজ স্বীকৃত নয়। যেখানে পুরুষের হঠকারিতায় আসে মাতৃত্ব, কিন্তু তার ফলে যে সামাজিক লাঞ্ছনা তার সবটুকু সইতে হয় শুধু নারীকে। কখনো বা আশ্রিতের মত কেটে যায় সারাজীবন, তবু মায়ের সম্মান সে পায় না কারণ তার মাতৃত্ব যে সমাজবাঞ্ছিত নয়।

আসলে অবিবাহিত মাতৃত্বকে মানে না সমাজ। তথাপি রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে অবিবাহিতা অন্তঃসত্ত্বা ননিবালা সম্পর্কে জগমোহন বলেছিলেন-

“মা যে! ... জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন।”১ এ হল যুক্তির কথা। তবে সমাজ এ যুক্তি মানে না। তাই তো আজও অনেক মেয়েরা সামাজিক এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে যায়।

তবে শৈলবালার ‘করুণদেবীর আশ্রম’ গল্পের যমুনা যখন আত্মহত্যা করতে যায়, তখন কোনো এক সদাশয় ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে ‘করুণাময়ী’ আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে যমুনা এক সন্তান প্রসব করে সুস্থ হয়ে ওঠে। পুনর্জীবন পেয়ে সে হঠাৎ একদিন শহরে চলে আসে। আর সেখানে এসে এক সাধুর কাছে যাতায়াত শুরু করে। কারন সেই সাধুই নাকি তার দীক্ষাগুরু। এক সময় সে তার কন্যাকে নিয়ে সেই সাধুর সঙ্গেই শহর ত্যাগ করে। গল্পের সমাপ্তি এখানেই। বলা যায় জীবন সম্পর্কে তথা মানবচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে শৈলবালার এ জাতীয় গল্প রচনা করা সম্ভব নয়। আর এ গল্পই তার যথাযোগ্য উদাহরণ।

শাশ্বত বাঙালি সমাজে নারীকে পুরুষ দেখেছে তার দৃষ্টি দিয়ে, চিরকাল বলেছে নারীর মনের কথা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কিসে তার সুখ, কিসে তার দুঃখ সে কথাও তারা নিজের ভাষাতেই বলেছে। কিন্তু এতে কি সত্যই নারীর মনের আর জীবনের সব কথা বলা হয়েছে? বলা যে হয় না তার প্রমাণ ‘আদেশ পালন’ গল্পের নায়িকা কনক। মহারাষ্ট্রের সমাজের পটভূমিকায় রচিত এই ট্রাজিক প্রেমের গল্পটি রচনা করেছেন শৈলবালা। শৈশব থেকে কনকের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়েছিল ভাইলালের। কিন্তু পঞ্চায়েতের সুনজরে পড়ার জন্য ক্ষমতার লোভে ভাইলাল কনককে অস্বীকার করে পঞ্চায়েত প্রধানের বিধবা বোনের সঙ্গে লাভ করতে থাকে।

অপমানিত, লজ্জিত কনক কর্তৃক ভাইলাল ধিক্কৃত হয়। এক সময় ভাইলালও সেই সঙ্গ লাভের মোহ থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কনক এতদিনে ভগবান বিঠোবার মধ্য দিয়ে তার প্রেমকে খুঁজে পায়। এমনকি বেঁচে থাকার অর্থও যেন খুঁজে পায়। তবে পাঁচ বৎসর পর ভগবান বিঠোবার দর্শন করতে আসতে গিয়ে ভাইলাল যখন মরো মরো অবস্থায় পড়ে থাকে, তখন কনক ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে ভাইলালের সেবা করতে থাকে। মৃত্যুপথযাত্রী ভাইলাল ক্ষণিকের জন্য কনককে চিনতে পারে। সে কনককে তখন জ্ঞানদাত্রী সম্বোধনে জানায় যে, সে সত্যই তার পঙ্কিল জীবন থেকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে। এরপরেই ভাইলালের মৃত্যু হয়।

আসলে নারী শুধু প্রেয়সী নয়, স্ত্রী নয়, সে এক শক্তিস্বরূপাও। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই এই নারীমনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হতো না। পুরুষতন্ত্রের ঘোষণায় নারীজীবনে আমিত্বের কোনো স্থান নেই। নারী প্রেমময়ী, গৃহলক্ষ্মী, জননী কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। ব্যক্তিসত্তার জন্য যে বিশিষ্টতা প্রয়োজন নারীর তা আছে কিনা এ নিয়ে পুরুষপক্ষের সংশয়ের অন্ত নেই। কিন্তু এরপরেও কনকের মতো নারী মৃত্যুপথযাত্রী ভাইলালের অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে তার সেবা করে। বলা যায় নারী যেভাবে কোনো পুরুষকে ভালোবাসতে পারে, আবার তার অন্যায়ে তাকে যেভাবে ধিক্কার দিতে পারে, ঠিক সেভাবে তার অসুস্থতার সময় সমস্ত অন্যায় ভুলে গিয়ে সেবা করার শক্তিও রাখে। নারীকে তাই শক্তিস্বরূপা বলা হয়।

আবার নারীর এই চিন্ময়ী রূপ যখন মৃন্ময়ী রূপে ধরা দেয়, তখন শৈলবালার লেখা ‘কর্পূরের মালা’ গল্পের জগন্নাথ দেবের সেবায়ত রঞ্জনও পারে না তার আকর্ষণ এড়াতে। গল্পটিতে তাই পুরীর মন্দির দর্শনে এসে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছবিকে সে উদ্ধার করে তুলে দেয় তার আত্মীয় পরিবারবর্গের কাছে। রঞ্জন তখন থেকেই সেই পরিবারের সঙ্গে মিশে যায়। এমনকি ছবির মায়েরও তাকে জমাতা হিসেবে পছন্দ। আর এই ইচ্ছের কথা শুনে রঞ্জন পুলক অনুভব

করতে থাকে। কিন্তু পুরীতে রঞ্জনের কর্মবহুল দিনগুলো অসহ্য হয়ে ওঠে। এক সময় কাজে ইস্তফা দিয়ে সে চলে আসে বাংলাদেশে। একদিন এক গৃহে সে চুপচাপ ঘুরে বেড়াতে থাকে অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চেপে। রঞ্জন জানতেই পারে না যে এর পূর্ব রাত্রে ছবির বিয়ে হয়ে যায়। অবশেষে বর-কনে রওনা হয়ে গেলে গাড়ির পেছন পেছন সে ছুটে আসে এবং আশীর্বাদ স্বরূপ উভয়ের হাতে তুলে দেয় একটি করে কর্পূরের মালা। গাড়ী ছুটে চলে, আর কর্পূরের মতোই মিলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় রঞ্জনের স্বপ্ন।

কোনো কৃত্রিম বিন্যাসে নয় গল্পের বিশিষ্ট বক্তব্য এবং গল্পের মেজাজটাকে শিল্পীসুলভ দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন শৈলবালা। তাই আজকের সময়ের আমরা পাঠক পাঠিকাও গল্প পাঠ শেষে রঞ্জনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাই।

কিন্তু মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে প্রিয়কে দেবতা আর দেবতাকে প্রিয় করার সাধনা চলে আসছে যুগে-যুগে, দেশে-দেশে, কালে-কালান্তরে। তাহলে শৈলবালাকে প্রেমের গল্প লিখতে কেন বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর মহারাষ্ট্রে কিংবা ওড়িশায় যাত্রা করতে হলো? তবে এ প্রশ্ন আমাদের মনে শুধু প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যায়। এর উত্তর পাওয়া আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর অন্যান্য গল্প, উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বোঝা যাবে তাঁর এই ধারণার যৌক্তিকতা।

তাঁর ভণ্ডের সার্থকতা গল্পে দেখি, মনুষ্য সমাজে একদল লোক যে সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে মহান হয়ে ওঠে তার পেছনে থাকে চূড়ান্ত ভণ্ডামি। এটর্নি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এই গল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন। বিধবা পিসিমার সমস্ত সম্পত্তি ও টাকা পয়সা সে আত্মসাৎ করে নেয়। এমনকি তিনতলা গৃহে বিদ্যুতের আলোর রোশনাই, নামকরা কোম্পানির ফার্নিচার, নিজস্ব পাড়ি প্রভৃতির ব্যবস্থাও করে নেয়। কিন্তু সেই অসহায় মহিলাটি যতবার তার পুত্রের অসুস্থতার কারণে কিছুমাত্র সাহায্যের আশায় তার দরজায় এসেছে, ততবার তাকে নিঃস্ব হাতে ফিরে যেতে হয়েছে। অথচ জেল ফেরত আসামী পীর মহম্মদকে তার ছোরার ভয়ে টাকা দিয়েছে তৎক্ষণাৎ।

আসলে সেকালের বাল- বৈধব্যপীড়িত বাঙালি সমাজের এটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। নারী তার স্নেহ-মায়া-ভালোবাসা –ত্যাগ তিতিক্ষা- সবকিছু উজাড় করে দিলেও সমাজ বা আত্মীয়ের কাছ থেকে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পেতো না।

শৈলবালার ‘দীপ্তি’ গল্পটিতে দীপ্তি শিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী।প্রতিবারের মতো এবার সে তার হাইকোর্টের উকিল দাদুর সঙ্গে কাশীতে বেড়াতে এসেছে। বি.এ. পাঠরতা দীপ্তি পাশের প্রতিবেশী গ্রহে অসহায় দুইমহিলার যেমন খোঁজ নেয়, তেমনি তার নিজের বাড়ির সরকার মশায়ের বিধবা ভাদ্র বৌ-এর সম্পত্তি গ্রাসকে সমর্থঙ্করে না। এর প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনে সে দাদামশায়ের সাহায্যও গ্রহণ করে। আবার দীপ্তি এতই সুরসিকা যে মহর্ষি মনুর নারীবিরোধী উক্তি নিয়ে যেমন বিদ্রূপ করতে পারে, তেমনি বিবাহের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

মনে পড়ে যায় শৈলবালার পূর্বে লেখা অনুরূপা দেবীর একটি গল্পের কথা। গল্পটির নাম ‘উড়ো চিঠি’। যেখানে অমিয়া পাত্রপক্ষের মেয়ে দেখা নিয়ে বলে-

> “আমি কি শাক না মাছ, যে, আমায় যে-সে এসে
> নেড়ে-চেড়ে দেখে যাবে।”[২]

কিন্তু চিরন্তন নারী সমাজ পুরুষ নির্ধারিত নিয়ম শৃঙ্খলের আবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও অনেক সময়ই তার দ্বিধান্বিত মন তাঁর উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে। আর ঠিক এরকমটাই হয় শৈশবালার দীপ্তির সাথে। সে যতই ,মনুর স্ত্রী সম্পর্কে মতামত নিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে আর দ্বিধা ছিল। তাই প্রতিবেশিনী প্রৌঢ়া তার উচ্চশিক্ষা বিষয় শঙ্কিতই হন। তবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা যে শুধু ফ্যাশন নয়, তার প্রয়োজন আছে, লেখিকা দীপ্তির মাধ্যমে তা স্পস্ট জানিয়ে দিয়েছেন-

> “আমাদের এখন বুঝতে হয়েছে, লেখাপড়া শেখাটা একটা
> বিশেষ শ্রেণীর আলস্য-বিলাস বা ফ্যাসন মাত্র নয়।

মানুষ হওয়ার পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে সৎ এবং
ভদ্র হওয়ার পক্ষে, জ্ঞানচর্চ্চাটা অত্যন্ত আবশ্যক।”৩

শৈলবালা হয়তো তাঁর নিজের জীবন তথা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। গল্প- তো আসলে মানুষের জীবনের উজ্জ্বল আয়না। এ এমনই চারুকার্য যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে নিজেকে আবিষ্কার করার। এমনই তাঁর অন্য একটি গল্প হচ্ছে ‘বিজয়ার নমস্কার’। গল্পে নারী জীবনের অসহায়তা, বঞ্চনার পাশাপাশি তার সৃষ্টিশীলতা, তার সৃজনী প্রতিভাকে নন্দিত করেছেন শৈলবালা। ব্যথাহারিণী তার বিবাহিত জীবনে আর্থিক সম্পদের বাহুল্য পেলেও স্বামীসঙ্গ বিশেষ পায় নি। কারণ মামলা- মোকদ্দমা করতে করতে ভায়ে- ভায়ে মারামারির ফলে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, আর সমাজের স্বাভাবিক অধিকারে ভাসুর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর পিসতুতো ভাই- এর আশ্রয়ে সে লেখাপড়া শেখে এবং সেখান থেকে স্থান্তারিত হয় পিসির শ্বশুরগৃহে। সেখানে সে একজন আত্মীয়া। তাই বাড়ির ঝি-চাকরের থেকেও বেশি তাকে কাজ করতে হয়। বিনিময়ে সে পায় শুধুমাত্র লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবহেলা আর অপমান।

আসলে উনিশ শতক থেকেই অনেক মেয়েদের জীবন পরিস্থিতি ছিল লাঞ্ছনা তার নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত। জন্ম- পরিবার থেকে উপড়ে এনে যে পরিবারে তাদের রোপণ করা হত, সেখানে কোনো শান্তির আকাশ থেকে কোনো শুশ্রাষার জল তাদের প্রাপ্য ছিল না। সেই জলের আশায় মেয়েরা শুকিয়েই ঘরে যেত, তাদের হত্যা করার জন্যে আর আলাদা করে কষ্ট করার দরকার হত না।

তবে শৈলবালার ‘বিজয়ার নমস্কার’ গল্পের দুর্গা এত অপমানের পরেও পড়াশুনার সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। তাই নামকরা পত্রিকায় তার হাসির কবিতা যথামথ তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, ব্যথার প্রবল অসুস্থতা জেনে তিনি তাকে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর গৃহে। দিনটা সেদিন ছিল বিজয়া। সত্যই আমাদের সমাজ দশভুজা দেবী দুর্গার মতো মেয়েগুলোকে নিতান্ত অনাদরে, অবহেলায় বিসর্জন দিয়েছে অতি সহজে। কজনই বা ব্যথাহারিণীর মতো শেষ মুক্তিটুকু লাভ করেছে। হউতো বা অকালে ঝরে গেছে কত প্রতিভা।

কেন জানি মনে হয় শৈলবালা নিজেকেই কি দেখতে চেয়েছেন ব্যথাহারিণীর মধ্যে দিয়ে? কারণ ব্যক্তিগত জীবনে শৈলবালা তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বারার নানা অত্যাচারের শিকার হয়েছে। তথাপি এই পরিস্থিতিতেও তাঁর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। হয়ত এখানেই তিনি খুঁজে পেতে চান নিজেকে।

আসলে যে কোনো লেখক বা লেখিকা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজেন। যেখানে তিনি অনেক বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে যাচাই করেন। আবার নিজেকে আস্বাদও করেন। আত্ম- আস্বাদের এই বিভিন্ন প্রকাশে আমরা পাই বিভিন্নতার আনন্দ।

শৈলবালার ঘোষজায়ার ছোটগকপের বিষয় মূলত মানুষ আর এই সামাজিক মানুষের বিচিত্র আচরণ তাঁর গল্পের প্রধান বিষয়। এ সবই তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার ফল। এ সমস্ত অভিজ্ঞতা কখনোতিনি প্রকাশ করেছেন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে, কখনো রূঢ় বাস্তবতায়, কখনো বা হাসির ছটায়। তবে তাঁর গল্পে মেয়েদের জীবনে মনন চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্র বড়ো সংকীর্ণ। তিনি জানেন সমাজে শুধু মেয়েদের জন্যই অধিকারের বিধিলিপি নির্দিষ্ট হয়েছে। জীবনে যত বঞ্চনা, যত নিষ্করুণতা, যত অনুদারতা-সমস্ত বহন করার দায় নারীর। আর বিনা বিচারে অথবা অন্যায় বিচারে তাকে ছুঁড়ে ফেলার অধিকার সেসব পুরুষেরই, যারা তার আজীবন রক্ষক। তাই তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই সহজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরার পাশাপাশি বদলে দিতে চেয়েছেন সার্থক, স্বাধীন নারী জীবনের সংজ্ঞা। মনে পড়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী একবার বলেছিলেন, মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রস্রষ্টা একজনই হয়,যা সমস্ত জগৎ উচ্চারণ করে কৃতার্থ হয় এবং আরতি করে আপনাকে সার্থক করে তুলে। তাই- আমরা বলতে পারি সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব কিন্তু শৈলবালা মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রস্রষ্টার তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট।

তথ্যসূত্র:

১/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ- ভাদ্র, ১৩৯৪; পৃঃ ৪৩২।
২/ অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সম্পাদনা); অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প; দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর, ২০০২; পৃঃ ৭৩।
৩/ অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংকলক); শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প- সংকলন; দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ২০০০; পৃঃ ১৭০-১৭১।